গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৯ সেপ্টেম্বর মহামিছিল থেকে উঠবে

বৃহত্তর গণআন্দোলনের দৃপ্ত আহ্বান

উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির নেতা ও মন্ত্রীরা। তাঁরা বলছেন — দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে। তাঁদের সাথে দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা বলছেন — এই তো চাই, এই তো চাই। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভিতে এইসব নেতা মন্ত্রী ও শিল্পপতিদের দেখানো হচ্ছে, তাঁদের বাণী ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। তার তলায় চাপা দেওয়া হচ্ছে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের দীর্ঘশ্বাস। চাপা দেওয়া হচ্ছে বেকারি, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অসহায়তা ও অনিশ্চয়তায় ভরা তাঁদের প্রতিদিনের জীবনকাহিনী। কে দাঁড়াবে এই অসহায় বঞ্চিত অত্যাচারিত মানুষদের পাশে?

কংগ্রেস এবং বিজেপি পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজস্ব দল। তৃণমূল কংগ্রেসও তাই। তার সাথে আছে এই দলটির কেবল স্টান্ট দেওয়া রাজনীতি। বামপন্থার ঝাণ্ডা হাতে সিপিএম-ফ্রন্টও বহু আগে থেকেই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। শ্রমজীবী জনগণকে বিভ্রান্ত করে কৌশলে নিজেদের পক্ষে আটকে রাখা এবং পাশাপাশি মালিকশ্রেণীর দাসত্ব করে যাওয়া — এটাই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এস ইউ সি আই ছাড়া বিশেষ আর কেউ নেই মেহনতী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো। সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে দল সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। গরিব-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের থেকে প্রাইমারিতে ইংরেজি শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। এ পরিকল্পনা কংগ্রেস সরকারেরই, কিন্তু তারা কার্যকর করতে পারেনি, সিপিএম করেছে। এর বিরুদ্ধে টানা ১৯ বছর লড়াই করেছে এস ইউ সি আই। এই অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিপুল জনসমর্থনে সফল হয়েছে এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্ধ। বিপুল জনসমর্থনে পুষ্ট সেই আন্দোলনের কাছে মাথা নত করে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে উদ্ধত রাজ্য সরকার। হাসপাতালে বিপুল হারে চার্জ বাড়িয়েছিল সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার; লড়েছে এস ইউ সি আই; বহুক্ষেত্রেই কমেছে সেই চার্জ। গোয়েঙ্কা কোম্পানির বিদ্যুৎ সংস্থা সি ই এস সি এবং সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের অশুভচক্র বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চলেছে, প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই। স্কুলে-কলেজে ব্যাপকহারে ফি-বৃদ্ধি এবং ডোনেশন প্রথার বিরুদ্ধে লড়ছে এস ইউ সি আই এবং এই লড়াইয়ের ফলে বহু প্রতিষ্ঠানেই বর্ধিত ফি কমাতে পারা গিয়েছে। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতাতেই এইসব দাবির সাথে জনজীবনের আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহামিছিল। সেই মহামিছিলে কোটি কোটি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে লক্ষ মানুষের জোয়ারে ভাসবে কলকাতা। কারণ অভিজ্ঞতা বলছে, ভোটের মধুর বাণীতে জীবনের সমস্যা মিটবেনা, তার জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী সংগঠিত আন্দোলন। এস ইউ সি আই জীবনপণ করে সেই আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলছে। সাধারণ মানুষের তাই ভরসা — পুঁজিপতি ও ধনী ব্যবসায়ীদের দল সব পার্টিকে কিনে নিলেও এই একটি পার্টিকে কিনতে পারেনি। গদীর লোভ, মন্ত্রীত্বের মোহ, টাকার থলির লালসা পথভ্রষ্ট করতে পারেনি এস ইউ সি আইকে। এস ইউ সি আই জনগণের পাশে আছে।

সমস্ত অংশের গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবন আজ সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত।

আটের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিদ্যুৎ বিল বয়কট রাজ্যে আইন অমান্য

৯ সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা কলকাতায় বিল বয়কট এবং জেলায় জেলায় আইন অমান্য করেন।

কলকাতা ও হাওড়া

অবিলম্বে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল এবং বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহার, সি ই এস সি-তে ইনকাম ট্যাক্স পদ্ধতির স্ল্যাব চালু রাখা, গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ এবং জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে কলকাতায় ধর্মতলা, তারাতলা, ম্যান্ডেভিলা, শ্যামবাজার, বেলঘরিয়া, হাওড়ায়, সি ই এস সি-র রিজিওনাল অফিস সহ সবকয়টি ক্যাশ কাউন্টারেই বিল বয়কট চলে। ৯৫% গ্রাহক বিল বয়কট করেছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

চৌরঙ্গি কাউন্টারের সামনে পথসভায় অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সজ্জিত বিশ্বাস বলেন আজকের বিল বয়কটে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থনের পরেও রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্দোলন তীব্রতর করা হবে। তিনি সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি না করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে জনগণকে চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান করেন।

ঐ দিন রাজ্যের সবকয়টি জেলা সদরে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা জমায়েত হয়ে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আইন অমান্য করেছেন। বিকাল পর্যন্ত জানা গিয়েছে বিভিন্ন জেলায় মোট ৫০১২ জন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন।

৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সি ই এস সি'র খোলা ক্যাশ কাউন্টার। গ্রাহকরা আসেননি বিল জমা দিতে। সর্বত্রই ছিল এই একই চিত্র।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জেলার বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে জমায়েত হয়ে মিছিল করে আলিপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরের কাছে পৌঁছালে পুলিশ

সাতের পাতায় দেখুন

ডি ওয়াই ও রাজ্য সম্মেলন ঃ যুবশক্তির কাছে বিপ্লব সাধনার ডাক

জয়নগর-মজিলপুর — ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। পরাধীন ভারতের এবং স্বাধীন ভারতের বহু বিপ্লবীর স্মৃতিধন্য এই শহরেই গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে চতুর্থ রাজ্য যুব সম্মেলন। উত্তরে সুদূর দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকেই যুব প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত হন এই শহরে। সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন, কনভেনশন ও আন্দোলনের নানা কর্মসূচি এবং বিপুল সংখ্যায় সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে ডি ওয়াই ও একটা সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সম্মেলনকে সামনে রেখে জয়নগর সেজে উঠেছিল ফেস্টুন, ব্যানার, দেওয়াল লিখনে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে গণআন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত তোরণগুলি মিছিলের যাত্রাপথে শোভা পাচ্ছিল শহরের মোড়ে মোড়ে। সম্মেলন উপলক্ষে জয়নগর-মজিলপুরের নামকরণ করা হয়েছিল পরাধীন ভারতের বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যের নামে। ৩ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকেই নানা পথ ধরে আসতে থাকে বিপুলসংখ্যক যুবকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃপ্ত মিছিল। দুপুরের রোদ যত গড়িয়েছে সমস্ত মানুষের গতি যেন একমুখী হয়েছে

তিনের পাতায় দেখুন

নদীর জলবণ্টন সমস্যা

একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

সাম্প্রতিককালে, বিশেষত আধুনিক কৃষির প্রবর্তন ও সেচের জলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে নদীর জল ভাগাভাগির প্রশ্নে ভারতের একাধিক রাজ্যের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যাচ্ছে। আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়ছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে বিবাদ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে সামনে এসেছে। কোন্ নীতির ভিত্তিতে এইসব বিবাদের সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে তা খতিয়ে দেখা অবশ্য প্রয়োজন।

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে মানুষের জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান যে জল, নদীই হল তার প্রধান উৎসগুলির অন্যতম। নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের কাছে এর জল ব্যবহারের বিষয়টি সর্বদাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য নদ-নদী এদেশের সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। নদীর জলবণ্টন নিয়ে এদেশে বহু বিরোধ যেমন হয়েছে, তেমন অনেক বিরোধের মীমাংসাও হয়েছে। সম্প্রতি পাঞ্জাব বিধানসভায় 'পাঞ্জাব টার্মিনেশন অফ এগ্রিমেন্ট বিল-২০০৪' পাশ হয়ে যাবার পর জলবণ্টনের বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে নদীজলের বণ্টন নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। এখন অনভিপ্রেতভাবেই সেই পুরানো বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায়, শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মানুষকেই নয়, সারা দেশের মানুষকেই এই প্রশ্নটি খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। জলবণ্টন সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়। সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তাই শুধু আবেগের বশে, শোনা কথার ওপর নির্ভর করে এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা উচিত নয়। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করে গৃহীত এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত কিছু নীতির ভিত্তিতেই দেশে দেশে জলবণ্টন সমস্যার সুরাহা করা হয়। সেই স্বীকৃত নীতিগুলি সর্বপ্রথম জানা দরকার।

জলবণ্টন বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নীতিসমূহ

ছোট-বড় সমস্ত নদীরই নিজস্ব অববাহিকা আছে। নদীর উৎস ও গতিপথের যে অঞ্চল থেকে জল এসে নদীতে পড়ে, অথবা শাখানদী ও উপনদীর মাধ্যমে যে অঞ্চল থেকে জল মূল নদীতে ঢোকে বা নদী থেকে শাখানদী ও উপনদীতে বেরিয়ে যায় এবং যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী এবং ছোট নদীগুলি সমুদ্রে কিংবা অন্য নদীতে পড়ে, সেই সমগ্র অঞ্চলটিকে সেই নদীর অববাহিকা বলে। নদীর জলবণ্টন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথম নীতিটি হল — একটি নদীর সমগ্র অববাহিকা অঞ্চল যদি দু'টি পৃথক দেশ, পৃথক প্রশাসনিক ক্ষেত্র কিংবা একই দেশের দু'টি ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত থাকে, তাহলেও ঐ অববাহিকা অঞ্চলের সমস্ত মানুষেরই নদীটির জলের ওপর অধিকার থাকবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সিন্ধু, চেনাব, ঝিলম, রাভি, বিপাশা এবং শতদ্রু — এই যে ছ'টি নদী এদেশের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে মিশেছে, তার গতিপথের প্রথমাংশের অববাহিকা ভারতে পড়েছে এবং গতিপথের শেষাংশ সমুদ্রে মেশার আগে অববাহিকা পড়েছে পাকিস্তানে। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র বয়ে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। এই নদীগুলির জলের ওপর দু'টি দেশেরই অধিকার বর্তায়। সেই মতো, বহু টানাপোড়েনের পর ১৯৬০ সালে সিন্ধু নদীর জলবণ্টন সম্পর্কে দু'টি দেশের ঐকমত্য হয় এবং সিন্ধু, চেনাব এবং ঝিলম নদীর ওপর পাকিস্তানের অধিকার মেনে নেওয়া হয়, ভারত সরকার ১১০ কোটি টাকা দেয়। অন্যদিকে রাভি, বিপাশা এবং শতদ্রু নদীর ওপর ভারতবর্ষের অধিকার স্বীকৃত হয়।

একইভাবে গঙ্গা নদীর (যার বাংলাদেশের অংশের নাম পদ্মা) জলবণ্টন বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ 'ফারাক্কা ব্যারেজ এগ্রিমেন্ট' নামক একটি চুক্তি করে। নীল নদ ঘিরে সুদান ও ইজিপ্ট-এর জটিল বিতর্কও মেটানো হয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অববাহিকা নীতির ওপর ভিত্তি করে। ঐ একই নীতির ওপর ভিত্তি করে এদেশের ভিতরেও কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে জলবণ্টন চুক্তি হয়েছে। যমুনা নদীর জলবণ্টন নিয়ে হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও রাজস্থান — এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে ১৯৫৪ সালে যে চুক্তি হয়েছিল, তাও ঐ অববাহিকা নীতির ভিত্তিতেই।

জলবণ্টন সংক্রান্ত দ্বিতীয় নীতিটি হল কায়েমী অধিকারের নীতি। সংক্ষেপে একে বলা হয় — "আগে যে এসেছে আগে যে দেখেছে" নীতি। এই নীতি অনুসারে কোন অখণ্ডিত রাজ্য বা দেশ যদি কোন নদীর জল ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে সেই দেশ বা রাজ্যটি ভাগ হয়ে যাবার পরও যারা আগে থেকে যেমন জল ব্যবহার করছিল তারা তেমনই ব্যবহার করার অধিকারী হবে। এ সংক্রান্ত তৃতীয় নীতিটি হল, দু'টি রাজ্য যদি কোন সময়ে জলবণ্টন সংক্রান্ত কোনও চুক্তি করে, তাহলে ভবিষ্যতেও সেই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

এছাড়াও অপর একটি নীতিতে বলা হয়েছে, একটি দেশের কোনও অঞ্চল যদি কোনও বিশেষ নদীর অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত নাও হয়, তবু ঐ নদীটির জল টেনে এনে ঐ অঞ্চলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিষ্কার করে বললে এই নীতির অর্থ দাঁড়ায়, একই প্রশাসনিক-রাজনৈতিক আওতাভুক্ত অঞ্চলের জলাভাবগ্রস্ত এলাকা যে নদীর অববাহিকায় অবস্থিত নয়, সেই নদীর জলও জলবহুল এলাকা থেকে জলাভাবগ্রস্ত এলাকায় টেনে এনে প্রয়োজন মেটানো যাবে। যেমন কৃষ্ণা নদীর অববাহিকা থেকে বহুদূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া কৃষ্ণা নদী থেকে ৩৩০ কিমি লম্বা 'তেলুগু-গঙ্গা খাল' কেটে পানীয় জল তামিলনাড়ুতে সরবরাহ করা হয়। এটা করা সম্ভব হয়েছে, কারণ তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ — এই দু'টি রাজ্যই ১৯৫১ সালের আগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হরিয়ানা রাজ্যটি রাভি, বিপাশা এবং শতদ্রু নদী তিনটির অববাহিকায় অবস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও কেন এই নদীগুলির জলের ভাগ হরিয়ানা পাবে — এব্যাপারে পাঞ্জাব সরকারের দেওয়া যুক্তিগুলি আমাদের বিচার করতে হবে, ওপরে উল্লেখিত একসময় একই প্রশাসনিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত দু'টি রাজ্যের মধ্যে জলবণ্টন সংক্রান্ত নীতিটির ওপর ভিত্তি করেই। কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা আগে একই প্রশাসনিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরিস্থিতি পৃথক হলেও হরিয়ানা ও পাঞ্জাব একই পুঁজিবাদী শোষণের শিকার

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য দু'টির মধ্যে জলবণ্টন সংক্রান্ত সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করার আগে এই দুই রাজ্যে যে বাস্তব পরিস্থিতি রয়েছে তার প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে অনেক সময় দেখা যায় যে, দুই রাজ্যের নদীজল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা একরকম নয়, ভিন্নরকম। আমাদের বোঝা দরকার, যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত কম বা অনিশ্চিত, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের জলের পরিমাণ সীমিত, কৃষিকাজ যেখানে মূলত সেচনির্ভর; খাল, কুয়ো, পাম্পসেট ইত্যাদির উপর নির্ভরতা সেখানে বেশি। যেসব এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল রয়েছে, সেখানেও যদি জল সঞ্চয়ের হারের তুলনায় জল উত্তোলনের হার বেশি হয়ে যায়, তাহলে ভূগর্ভে জলের স্তর নেমে গিয়ে জলাভাব দেখা দিতে পারে। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব রাজ্য দু'টির ভূমি ও মৃত্তিকার গঠনে প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। ফলে জমির উর্বরতা এবং লভ্য জলের পরিমাণের মধ্যেও তফাৎ রয়েছে। পাঞ্জাবের মাটি মূলত সমতল, সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত এবং সেখানে দোঁয়াশ মাটি থাকায় সে মাটি অত্যন্ত উর্বর। অন্যদিকে, হরিয়ানার অর্ধেক, বিশেষত তার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি অসমতল, পাথুরে টিলা এবং বালিয়াড়িতে ভরা। ফলে মাটি সেখানে মূলত অনুর্বর। এই অঞ্চলে ভূগর্ভ এবং ভূ-পৃষ্ঠের জল কোনটাই নেই বললেই চলে, এমনকী এই অঞ্চলে সেচের জন্য যে খালগুলি কাটা হয়েছিল, সেগুলিও কোনদিন জলে ভরে ওঠেনি। ফলে এই রাজ্যে কৃষিকাজ, বিশেষত খারিফ শস্য অতি অল্প বৃষ্টির জলের ওপরেই নির্ভরশীল। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ জল বছরের পর বছর ধরে তুলে তুলে খরচ করে ফেলায় হরিয়ানার কিছু কিছু অঞ্চলে ভয়ঙ্কর খরা দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও মাটির ১৬০০ ফুট নিচেও ভূগর্ভস্থ জলের দেখা পাওয়া যায় না, কোথাও আবার জল লবণাক্ত হওয়ায় পান করা বা চাষের কাজে লাগানো যায় না। পরিস্থিতি আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, জলের অভাবে হরিয়ানাবাসীর জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। সেচের অভাবে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এরই সঙ্গে খরার প্রকোপে এবং পানীয় জলের অভাবে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষিশ্রমিক এবং অন্যান্য দিনমজুররা তাদের কৃষিসংশ্লিষ্ট চিরাচরিত কাজ হারাচ্ছে। ছাঁটাই, লক-আউট ও লে-অফের ফলে শহরাঞ্চলে ইতিমধ্যে ক্রমাগত বেড়ে চলা বেকার সমস্যার সঙ্গে গ্রামীণ কর্মচ্যুতি যুক্ত হয়ে বেকার সমস্যাকে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের বিপর্যয়কর নীতি, যা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই কৃষিক্ষেত্রেও চালু করেছে। এর ফল হিসাবে, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম সংগ্রহমূল্যে সরকারি ক্রয় বন্ধ হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি বন্ধ তো হয়ইনি, বরং আগের তুলনায় আরো বাড়ানো হয়েছে। ডিজেল, সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ এবং সেচের জলের মতো চাষের উপাদানগুলির দাম হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব — উভয় রাজ্যেই বেড়ে চলেছে। কারণ কেন্দ্রীয় এবং এই দুই রাজ্যেরই সরকারগুলি ক্রমাগত কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ কমাচ্ছে। একদিকে খরা এবং সেচের জলের অভাব, অন্যদিকে ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং ফসলের উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সাঁড়াশি আক্রমণে শুধু ছোট এবং গরিব চাষীরই সর্বনাশ হচ্ছে তাই নয়, মধ্যচাষীরাও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। চাষের খরচটুকু পর্যন্ত তুলতে না পেরে গরিব চাষীরা ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে এবং শেষপর্যন্ত নিজের সামান্য জমিটুকুও বিক্রি করে দিয়ে ধনী কৃষকদের বা কৃষি মহালের মালিকদের কাছে ঠিকা কাজ বা খেতমজুরের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে নিরুপায় হয়ে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, অনেক সময় গোটা পরিবারই নিজেদের শেষ করে দিচ্ছে এবং এ ঘটনা বেড়েই চলেছে। কৃষকদের এই মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি নদী, দীঘি এবং পুকুরের মতো প্রাকৃতিক জলের উৎসগুলিকে পর্যন্ত বেসরকারি মালিকদের হাতে মুনাফা লোটার জন্য তুলে দিচ্ছে। জল, যার অপর নাম জীবন, তাকে পণ্যে পরিণত করছে।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রের ও রাজ্যের প্রতিটি সরকার — তা যে দলেরই হোক না কেন — এই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তাই পাঞ্জাবের কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে বিনামূল্যে যে বিদ্যুৎ পেত, অমরিন্দর সিংয়ের কংগ্রেস সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে হরিয়ানা রাজ্যেও চৌতালা সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা বন্ধ করেছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার সেখানকার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দিতে প্রবলভাবে আগ্রহী। এরই পাশাপাশি এরা সকলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে খুবই সচেষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পড়ে থাকা বিদ্যুতের বাড়তি দাম জোর করে আদায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন হরিয়ানায় গড়ে উঠেছিল, অসংখ্য কৃষককে জেলে বন্দী করে রাজ্য সরকার সে আন্দোলন গায়ের জোরে দমন করেছে।

সংসদীয় দলগুলি ভোটের স্বার্থে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে জলবণ্টন সমস্যাকে কাজে লাগাচ্ছে

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই বিধানসভায় 'পাঞ্জাব টার্মিনেশন অফ এগ্রিমেন্ট বিল-২০০৪' পাশ হওয়ার ঘটনাটিকে বুঝতে হবে। পাঞ্জাব-হরিয়ানা সহ অন্যান্য রাজ্য সরকার এবং যেকোন রঙের সংসদীয় রাজনৈতিক দল কিংবা জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারগুলির এত বছরের কার্যকলাপে একথা স্পষ্ট যে, আন্তঃরাজ্য জলবণ্টনের বিষয়টি এই দলগুলির ভোটের স্বার্থে এবং গ্রাম কিংবা শহরের শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে আশীর্বাদের মতো কাজ করেছে। জলসম্পদের উৎস অনুসন্ধান করা, সুষ্ঠুভাবে সেই জল কাজে লাগানো এবং পানীয় হিসাবে ও সেচের বা অন্যান্য কাজে তা সুষ্ঠু ও বৈধভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে এই সরকারগুলি কোন সঠিক জলনীতি তৈরিই করেনি। বরং এ ব্যাপারে তারা চূড়ান্ত গাফিলতি, নিস্পৃহতা এবং বৈষম্যের পরিচয় দিয়েছে। এরা নেহাত ভোটযুদ্ধে জেতার কথা মাথায় রেখে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে জলবণ্টন নীতি প্রণয়ন করে। জলবণ্টন নিয়ে বছরের পর বছর চলতে থাকা বিবাদ খুব স্বাভাবিক কারণে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কায়েমী স্বার্থের রক্ষক ক্ষমতাসীন অথবা বিরোধী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের এই ন্যায্য ক্ষোভকে সুকৌশলে কাজে লাগায়, সংকীর্ণতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ এবং প্রাদেশিকতাবাদকে খুঁচিয়ে তোলে এবং এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। সুবিধামতো যখন যেরকম প্রয়োজন, সেইভাবে কখনো এ- পক্ষকে কখনো ও-পক্ষকে সুবিধা দেয়, অন্যদের বঞ্চিত করে। জলকে হাতিয়ার করে তারা দরকষাকষি করে, কোন্ রাজ্য জল পাবে, আর কোন্ রাজ্য জল দিয়ে তার বদলে রাজধানী শহর চণ্ডীগড় বা আবোহার- ফাজিলকা এলাকা পাবে — এই নিয়ে টানাটানি করতেও তাদের বাধে না। এইভাবে জলের মতো একটি বিষয়কে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে এই রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে।

এই আচরণ ও মনোভাবের পিছনে ইতিহাসেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল মূলত আপসমুখী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। ফলস্বরূপ, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিভেদের প্রাচীর ভেঙে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ

চারের পাতায় দেখুন

ডি ওয়াই ও’র চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশস্থল রক্তাখাঁ মাঠের দিকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিলনা। প্রায় ১০ হাজার যুব-ছাত্র উপস্থিত হয়েছিলেন এই সমাবেশে। রক্তাখাঁ মাঠের প্রবেশদ্বারের সুসজ্জিত তোরণে লেখা ছিল — ‘সমাবেশে আগত প্রতিনিধিদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন’।

ডি ওয়াই ও’র ওপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু হলে সভার সভাপতি হিসাবে কমরেড খাদিজা বানুর নাম প্রস্তাব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডি ওয়াই ও জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড শ্যামল প্রামাণিক এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন জেলার অন্যতম আহ্বায়ক কমরেড আনসার শেখ। সভার শুরুতে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ভূতনাথ মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী, সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ। সভার শুরুতে সম্মেলনে আগত প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, বিভিন্ন রাজ্যের ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ ও সমাবেশে উপস্থিত হাজার হাজার যুব-ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান জয়নগর-মজিলপুরের বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষানুরাগী, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ভূতনাথ মুখার্জী। তিনি বলেন, আমাদের এই রাজ্য ও সারা দেশ বর্তমানে এক কঠিন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা দেশের যুবসমাজের। আপনারা তাদেরই অংশ। এই সম্মেলন থেকে আপনারা ভবিষ্যত আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করবেন। আপনাদের প্রতি অভ্যর্থনা কমিটির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল। রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী বলেন, এই সেই মাটি, যেখানে একদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অসংখ্য দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সঠিক বিপ্লবী চিন্তাকে গ্রহণ করেছিল এই মাটি। সেই চিন্তাকে ভিত্তি করে এই মাটিতে ভূমিহীন চাষী-মজুরদের ঐতিহাসিক তেভাগা ও পরবর্তীকালে বেনাম জমি উদ্ধারের অবিস্মরণীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আজ সেই ঐতিহাসিক শহরেই চতুর্থ রাজ্য যুব সম্মেলন হতে চলেছে। এখান থেকেই নতুন করে যুব আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টি হবে।

প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল সমাবেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আজ যৌবন আক্রান্ত, নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসের মুখে, শিক্ষা আজ পণ্য ও সংকীর্ণ দলবাজির শিকার। একদিন এদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যে শিক্ষা চালু করতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তা কিছুটা হলেও চালু হয়েছিল, আজ তা ধ্বংসের মুখে। বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষা আজ প্রহসনে পরিণত। আজ ছাত্র-যুবকদের দেশের এই সংকটের মুহূর্তে শিক্ষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ আই ডি এস ও’র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী শিক্ষার দাবিতে ও বেকারির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র-যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ আই ডি ওয়াই ও কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ, ওড়িশা রাজ্য কমিটির কনভেনর কমরেড ধূর্জটি দাস, আসাম রাজ্য কমিটির কমরেড অজিত আচার্য, কেরালা রাজ্য সংগঠনী কমিটির কনভেনর কমরেড টি কে সুধীরকুমার, দিল্লি রাজ্য কমিটির কমরেড সতীশকুমার, বিহার রাজ্য কমিটির কমরেড ইন্দ্রদেও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, বিপ্লবী গণআন্দোলনের ভিত্তিভূমি জয়নগরে আসতে পেরে আমরা গর্বিত। আজ মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে রাজ্যে রাজ্যে যুব আন্দোলন গড়ে উঠছে। যুবসমাজের কাছে আলোর দিশা হিসাবে তাঁর চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অধ্যাপক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড তরুণ নস্কর বলেন, এই হাজার হাজার যুব-ছাত্রের সমাবেশ প্রমাণ করছে যে বাংলার যৌবন মরেনি। আপনারাই পারেন বিপ্লবী বামপন্থাকে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করতে। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ ফেডারেশনের পক্ষে রাজ্য সম্পাদক তপন গাঙ্গুলী, রেভোলিউশনারি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস প্রকাশ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আজ সারা দেশ গভীর সংকটে নিমজ্জিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক — এককথায় সার্বিক সংকটে আক্রান্ত। যুবসমাজও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। যুবসমাজের প্রধান সমস্যা বেকারি ও নৈতিকতার সংকট। তিনি বলেন, আজ আপনাদের ভাবতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর ৫৭ বছর অতিক্রান্ত। আজ দেশের চেহারা কী! শতকরা ৩৭ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১০ কোটি শিশু হোটেলে, দোকানে, কলে-কারখানায় কাজ করে। কোটি কোটি মানুষের কোন বাসস্থান নেই। দেশের বিশাল অংশের মানুষ শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। হাজার হাজার মানুষ অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মরছে। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে আপনাদের জীবনের প্রধান সমস্যা বেকারি। এই মুহূর্তে সারা দেশে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১৮ কোটি। বাস্তবে এ সংখ্যা আরও কয়েকগুণ। এ রাজ্যেও নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৬৯ লক্ষ। এরই সাথে একদা বামপন্থার পীঠস্থান পশ্চিমবাংলায় অবাধে চলছে মদ, জুয়া, সাট্টার অবাধ প্রসার। চলছে নারী ও শিশু পাচার। এই মুহূর্তে এরাজ্যে ৪০ হাজার ছোটবড় কলকারখানা বন্ধ। গ্রামে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ নেই। এই জেলার অমূল্য সম্পদ সুন্দরবন ও নদ-নদীকে সাহারা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে লুঠের জন্য। জল এবং জঙ্গলের উপর মানুষের সার্বজনীন অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আজ আপনাদের ভাবতে হবে, কেন এমনটা হল ? এটাই কি হওয়ার কথা ছিল ? এই জায়গাটা আপনাদের ধরতে হবে এবং বুঝতে হবে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম এদেশে মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রধান ধারকবাহক কংগ্রেসের হাতে। পরবর্তীকালে পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শোষণ-শাসন কায়েম রাখার জন্য অত্যন্ত কৌশলে তাদের বিকল্প মদতদাতা হিসাবে নিয়ে এসেছে বিজেপি ও তথাকথিত বামপন্থার তকমাধারী সিপিএম-কে। এরা সকলেই এদেশে পুঁজিবাদের হাত শক্ত করছে। পুঁজিবাদই সমস্ত শোষণ বঞ্চনার মূল কারণ। যুব আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ের পরিপূরকভাবে। কেননা বেকারি, অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদের উৎখাতের প্রশ্নের সাথেই এই সমস্যাগুলির সমাধানের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। আপনারা সেই লক্ষ্যেই যুব আন্দোলন গড়ে তুলবেন এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সভা শেষ করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশের শেষে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয় সেইদিনই রাত থেকে। রক্তাখাঁ মাঠ থেকে কয়েক কিমি পথ মিছিল করে প্রতিনিধি সম্মেলনের স্থান বহড়ু হাইস্কুল মাঠে পৌছান প্রতিনিধিরা। সারা রাজ্য থেকে ২০২৩ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু, কমরেড রূপম চৌধুরী, নন্দদুলাল দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনার জন্য কমরেড রূপম চৌধুরী, কমরেড খাদিজা বানু, কমরেড দীপক ব্যানার্জী, কমরেড প্রবীর মাহাতো, কমরেড প্রদীপ দাসকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড স্বপন দেবনাথ, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড সুরথ সরকার। সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন কমরেড রূপম চৌধুরী, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। মূল প্রস্তাবের ওপর সংযোজন-সংশোধনের জন্য বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ১০টায় জয়নগরে শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যের মূর্তিতে মাল্যদানের অনুষ্ঠান আগেই ঘোষিত ছিল। ঘোষণা অনুযায়ী মাল্যদান করেন ডি ওয়াই ও সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু, অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ। এছাড়া মাল্যদান করেন ডিএসও রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী ও জয়নগর-মজিলপুর কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাল্যদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর-মজিলপুর পৌর এলাকার এস ইউ সি আই এবং ডি ওয়াই ও কর্মীবৃন্দ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এ আই ডি এস ও’র ষষ্ঠ সম্মেলনে আগত পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি। অনুষ্ঠান শেষে ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে রাজ্য জুড়ে অনলাইন লটারির অবাধ প্রসার, সুন্দরবনকে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফাখোরদের কাছে বিক্রি করা, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন ও ইরাকে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে চারটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের মাঝে মাঝে প্রতিনিধিরা গান, আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশন করেন। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সংযোজন-সংশোধনীসহ মূল প্রস্তাব ও সাংগঠনিক রিপোর্টের সাথে অন্যান্য প্রস্তাবগুলিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কমরেড সুরথ সরকারকে সভাপতি ও কমরেড স্বপন দেবনাথকে সম্পাদক করে ৬৫ জনের রাজ্য কমিটি ও ৭৯ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভানেত্রী কমরেড খাদিজা বানু। বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

এ আই ডি ওয়াই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আয়োজিত চতুর্থ রাজ্য যুব সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

মঞ্চে আসীন (বাঁদিক থেকে) কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং কমরেড রূপম চৌধুরী

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ

প্রতিনিধি সম্মেলনে অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, আমার জন্ম ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলায়, অধুনা বাংলাদেশে। ঘটনাচক্রে ছেলেবেলায় এদেশে এসে কিছুদিন থাকার সময়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেইসময়ে এই ডি ওয়াই ও সংগঠনের সূচনাপর্বে এর সঙ্গে কিছুকাল আমার সম্পর্ক ছিল। এই সংগঠন গড়ে ওঠার সেই সময়ের কিছু স্মৃতি, কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে রাখব।

আপনারা জানেন যে, ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে যুদ্ধ লাগানোর উদ্দেশ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমবাংলা এবং বিহারের একটা অংশে ও ওড়িশার কিছু জায়গায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসময় আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে পার্টির যে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চিন্তাভাবনা তা নিয়ে কলকাতার আশেপাশে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক যোগাযোগ শুরু করি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে তৎকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে ‘কমিউনাল ডিস্টারবেন্স ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান’ নামে একটি প্রবন্ধ ‘স্যোসালিস্ট ইউনিটি’ নামে পার্টির সেইসময়কার ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ তখনকার সময়ে

পাঁচের পাতায় দেখুন

উমা ভারতীর গ্রেপ্তার ও মুক্তি

কংগ্রেস-বিজেপি'র গদীসর্বস্ব নীতিহীনতার নজির

কর্ণাটকের ধরম সিং-এর কংগ্রেস সরকার উমা ভারতীর বিরুদ্ধে নিজেদেরই করা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, উমা ভারতীকে যে অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তা ঠিকমতো বিচার না করেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল কেন?

উমা ভারতী বিজেপি নেত্রী, সম্প্রতি তিনি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সকলেই জানেন, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে প্রধান উস্কানিদাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ৬ ডিসেম্বর আদবানী এবং মুরলীমনোহর যোশীর সঙ্গেই ছিলেন তিনি এবং 'এক ধাক্কা আউর দো, বাবরি মসজিদ তোড় দো' স্লোগানে তিনি করসেবকদের উত্তেজিত করেছিলেন। মসজিদ ধ্বংস করার পর তাঁর উল্লাসের স্থিরচিত্র সংবাদমাধ্যমেও পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এই গুরুতর অপরাধের অভিযোগ কংগ্রেস সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আনেনি। তাঁর নামে চার্জশীট দেওয়া হয়েছিল ১৯৯৪ সালে কর্ণাটকের হুবলি শহরের ইদগা ময়দানের ঘটনাটির জন্য। ইদগা ময়দানে মুসলিমদের নমাজ বন্ধ করে হিন্দু দেবদেবীর পূজাপাঠ প্রচলন করতে তিনি জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণ দেন। পরিণতিতে দাঙ্গা বাধে এবং কিছু মানুষ তাতে নিহত হন। দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কর্ণাটক সরকার। ২০০২ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার এই মামলা তুলে নেবার জন্য আদালতে আবেদন করলে আদালত সেই আবেদন অগ্রাহ্য করে দেয়। এরপর বিষয়টি চাপা দিয়ে রাখা হয়।

সম্প্রতি বিজেপিকে পরাস্ত করে সিপিএমের সমর্থনে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস বসার পর বিজেপি বিরোধী দল হিসাবে কোন্ ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে, সেই প্রশ্নে কিছুটা মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবার্থে বিজেপি সরকারে থেকে ৫ বছরে যে কার্যকলাপ করেছিল, সেগুলি কংগ্রেসেরই গৃহীত নীতি ছিল এবং বর্তমানে কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় বসে তার সবগুলিই অনুসরণ করে চলেছে। ফলে ভোটের স্বার্থে নীতিগত বা কর্মসূচিগত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে লোকদেখানো বিরোধিতা পর্যন্ত করার সুযোগ বিজেপি'র নেই। তাই নিজেদের কলঙ্ক ঢাকা দিয়ে তারা কংগ্রেস জোট সরকারের 'দাগী' মন্ত্রীদের তল্লাশীতে নামে এবং পেয়েও যায় কয়লামন্ত্রী শিবু শোরেনকে। প্রায় ৩০ বছর আগের একটি দাঙ্গার ঘটনায় শিবু শোরেনের বিরুদ্ধে যে চার্জশীট বেরিয়েছিল, ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সরকার সেটাকেই কাজে লাগায়। শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করে শিবু সোরেন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এরপর বিজেপি শুরু করে কংগ্রেসের জোটে কত 'দাগী' আছে তার সন্ধান ও প্রচার। লালুপ্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তসলিমুদ্দিনের নামে একাধিক অভিযোগে আগেই জারি ছিল গ্রেপ্তরি পরোয়ানা; বিজেপি তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। রাবড়ি দেবীর বিহার সরকার তসলিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলি প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয় ; কিন্তু আদালত তা প্রত্যাহার করতে দেয়নি। এদিকে যে বিজেপি কংগ্রেসের মধ্যে দাগীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার নিজের দলে সেই দাগীর সংখ্যা কিন্তু কম নেই। রাজস্থানের বিজেপি সরকার তাদের মন্ত্রীসভার ১০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর ও খুনের প্রায় ১৫০টি মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। গুজরাটে দাঙ্গাকারী বিজেপি নেতাদের বাঁচাতে নরেন্দ্র মোদী যা করেছেন — সে সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। শিবু সোরেন এবং তসলিমুদ্দিনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ওপর বিজেপি যে চাপ দেয় তার পাল্টা চাপ দিতে কংগ্রেসও উমা ভারতীর গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়টিকে কাজে লাগায়। অর্থাৎ ২০০২ সালে কংগ্রেস সরকার যে মামলা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে আবেদন করেছিল, ২০০৪ সালে পরিস্থিতি বুঝে সেই মামলাকে ব্যবহার করে সেই কংগ্রেসই 'দাগী' উমা ভারতীর গ্রেপ্তার দাবি করে।

ফলে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন উমা ভারতী এবং আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বিপাকে পড়া বিজেপি এই অবস্থা থেকে ফায়দা তুলতে বর্তমানে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রথমত, তারা উমা ভারতীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটিকে নতুন কায়দায় প্রচার করছে। উমা ভারতীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া এবং তাতে মানুষের মৃত্যুকে চেপে রেখে তারা প্রচার করছে যে, ইদগা ময়দানে জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে কংগ্রেস সরকার উমা ভারতীকে জেলে ভরেছে। এইভাবে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট তুলে প্রচার করে তারা মহারাষ্ট্রে আগামী অক্টোবরের বিধানসভা নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে। এখন তারা 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের নামে প্রতিদিনই কোন না কোন নেতার নেতৃত্বে ১/২ হাজার সমর্থক নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করছে। এই প্রচারের প্রভাব মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে পাছে পড়ে — তা নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে শঙ্কিত, এবং সেইজন্য তারা উমা ভারতীর বিরুদ্ধে চলা মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে; উমা ভারতীকে মুক্তিও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজেপিও তার প্রচারের পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে। উমা ভারতীর মুক্তি পাওয়ার দিন বিজয় উৎসব পালন, উমা ভারতীকে নিয়ে রথযাত্রা করে হিন্দুত্বের প্রচার তুলে কংগ্রেসকে তারা পিছনে ফেলতে চাইছে।

কিন্তু অনেকের প্রশ্ন, সিপিএমের সার্টিফিকেট ও কংগ্রেসের প্রচার অনুযায়ী কংগ্রেস যদি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হয় তবে উমা ভারতীর অপরাধের বিরুদ্ধে তারা সুদৃঢ় অবস্থান নিচ্ছে না কেন? ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে তাদের কেন এমন দোদুল্যমানতা? এর প্রকৃত কারণ হল, কংগ্রেস কোনদিনই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি। তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতেও কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ হিন্দু ধর্মের দ্বারা, বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি আর এস এস-এর সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুদীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের নানাপ্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল কংগ্রেসই। আবার বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে সেখানে রামলালা পূজার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল কংগ্রেস, রাজীব গান্ধীর রাজত্বে। বিজেপি'র সহযোগী সংগঠনগুলি যখন বাবরি মসজিদ ভাঙছিল, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, নরসীমা রাও-এর কংগ্রেস তখন কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন। শুধু তাই নয়, মসজিদ ধ্বংসকারী করসেবকরা যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, সেজন্য বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার। এইভাবে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করার পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখত তারা। রাজীব গান্ধীর আমলেই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে কব্জা করতে তারা মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও খুশি করেছিল। শাহবানু মামলায় তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাকে স্বামী যাতে খোরপোশ দিতে বাধ্য হয়, আদালত সেই মর্মে রায় দিলে রাজীব গান্ধীর সরকার মুসলিম মৌলবাদীদের খুশি করতে তৎক্ষণাৎ পার্লামেন্টে মুসলিম মহিলা বিল পাশ করিয়ে আদালতের রায়কে বাতিল করে দেয়। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লীর বুকে শিখ নিধন কাণ্ড কংগ্রেসেরই কীর্তি। কিন্তু হিন্দুত্বের মূল কার্ডটি বিজেপি দখল করে নেওয়ায় এই খেলায় উগ্রতার নিরিখে কংগ্রেস কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, এই মাত্র। গদী দখলের লড়াইতে, নানা ধরনের ভোট ব্যাঙ্ক কব্জা করতে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েই সুবিধামত কৌশল গ্রহণ করছে। এর সঙ্গে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সম্পর্ক নেই। সিপিএম আজ কংগ্রেসকে যে ধর্মনিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট দিচ্ছে তার পিছনেও আছে গদী দখলের কৌশল। ওরা কখনো স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে পরাস্ত করার স্লোগান তুলে সাম্প্রদায়িক বিজেপি ও অন্যান্যদের সঙ্গে জোট বাঁধে, আবার কখনো সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে রোখার স্লোগান তুলে স্বৈরাচারী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধে। এমনকী এবার তারা ফেস্টুনে সোনিয়া গান্ধীর ছবির সঙ্গে কাস্তে-হাতুড়ি ছাপ নিয়ে মিটিং মিছিল পর্যন্ত করেছে। এর সবটাই ভোটকেন্দ্রিক।

ফলে, কংগ্রেসের বিজেপি-বিরোধিতার বা বিজেপি'র কংগ্রেস বিরোধিতার বাস্তবে কোন নীতিগত ভিত নেই। ভোট রাজনীতিই তাদের সবকিছুর মাপকাঠি। এই মাপকাঠির বিচারেই কোথাও সমর্থন, কোথাও বিরোধিতা। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে তোয়াজ করতে মাদ্রাসার উন্নতির জন্য নানা কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে খুশি করতেও কংগ্রেস নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিজেপি সরকার কুসংস্কারে ভরা যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার মালা জপতে জপতে কংগ্রেস ক্ষমতায় বসে সেটাকেই বহাল রেখেছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং আরএসএস-এর এবং শিক্ষায় গেরুয়াকরণের বিরুদ্ধে যে হুঙ্কার দিচ্ছেন সেটা আসলে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিজেপি তাদের যেসব দলীয় ব্যক্তিদের বসিয়েছে, তাদের সরিয়ে কংগ্রেসের পছন্দের ব্যক্তিদের সেইসব পদে বসানোই মূল কারণ। যে উমা ভারতীর উস্কানিমূলক বক্তৃতার পরিণতিতে দাঙ্গা সংঘটিত হল, হুবলীর মাটি রক্তাক্ত হল, মানুষের প্রাণ গেল, সেই উমা ভারতীর বিরুদ্ধেও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে কংগ্রেসের এই যে দোদুল্যমানতা — এটাকেও বিচার করতে হবে তাদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই।

সরকারি কর্মচারীদের গণ আইন অমান্য

গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তিন

সহস্রাধিক কর্মচারীর জমায়েত ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে রানি রাসমণি রোডের দিকে এগোতে থাকা এরকম উৎসাহব্যঞ্জক মিছিল সাম্প্রতিক কর্মচারী আন্দোলনে বিরল।

সারা মিছিল থেকে স্লোগান উঠতে থাকে — বেতন পুনর্বিন্যাস করতে হবে, ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা মূল বেতনে যুক্ত করতে হবে, মৃত কর্মচারীদের পোষ্যের চাকরি রদ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, কর্মচারী ও জনস্বার্থবিরোধী রি-ডিপ্লয়মেন্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে হবে।

এরপর বেলা দেড়টায় রানি রাসমণি রোডে সহস্রাধিক সরকারি কর্মচারী আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন।

পুরুলিয়ায় দূষণ রোধ ও রাস্তা মেরামতের দাবি আদায়

গত ২৪ আগস্ট এলাকায় গড়ে ওঠা স্পঞ্জ আয়রন কারখানার অত্যাধিক দূষণের বিরুদ্ধে, দিসেরগড় ঘাট থেকে রঘুনাথপুর ও মধুকুণ্ডী পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সারাইয়ের এবং নিতুরিয়ার সঙ্গে রঘুনাথপুরের সংযোগকারী হরিডির ভগ্নসেতু মেরামতের দাবিতে এস ইউ সি আই নিতুরিয়া লোকাল কমিটির আহ্বানে পথ অবরোধ করা হয়। প্রায় দেড় শতাধিক এস ইউ সি আই কর্মী এই পথ অবরোধে সামিল হয়। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা এই অবরোধ চলে। এলাকার জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। অবরোধে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল, এস এস ঠাকুর, নবনী চক্রবর্তী, জিতেন মাজি প্রমুখ। এর আগে একই দাবিতে গত ১৯ আগস্ট বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং আড়াই হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এস ইউ সি আই-এর এই আন্দোলনের পরেই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যৌবনকে জাগিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

— ডি ওয়াই ও রাজ্য সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। লেখাটিতে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচলিত বিশ্লেষণের বাইরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের বিশ্লেষণ, যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানো এবং জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে তোলার কাজটিতে যে ঘাটতি ছিল তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় কতদূর পর্যন্ত প্রোথিত তা উদঘাটিত করা হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক কাগজগুলির মধ্যে তৎকালীন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত 'আফসার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ইব্রাহিম হৌস। তিনি লেখাটির দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন এবং তাঁর পত্রিকায় প্রতিদিন বক্স করে লেখাটি ছাপতে থাকেন। উর্দু কাগজ হওয়ার কারণে কলকাতা ছাড়াও দিল্লি, এলাহাবাদ, আলিগড়, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর সহ ভারতবর্ষের প্রাচীন শহরগুলিতে উর্দুভাষী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই চিন্তাভাবনার একটা সংযোগ ঘটতে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিভিন্ন সংগঠন 'আফসার' কাগজে চিঠি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে জানতে চান। এইভাবে লেখাটিকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটা ব্যাপক অংশের মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

তখন 'মুসলিম পারসোনাল ল' নিয়েও খুব আলাপ-আলোচনা চলছিল। এইসব বিষয়গুলি নিয়ে যুবকদের সাথে আলাপ-আলোচনা গড়ে তুলতে কমরেড ঘোষ আমাদের বলেন। আমরা যুবকদের মধ্যে কাজ শুরু করি। কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় এগুলি নিয়ে ডিবেট, ডিসকাশন হতে থাকে। একে ভিত্তি করে আমরা ধীরে ধীরে কিছু যুবক বন্ধুদের সমবেত করতে পারলাম। তাঁরা আমাদের মিটিং-সমাবেশে আসতে শুরু করলেন। তখন কমরেড ঘোষ আমাদের বললেন, এই যে যুবকরা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সভা-সমাবেশে আসছেন এর একটা সংগঠিত রূপ দেওয়া দরকার। তাঁর নির্দেশে এই চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে একটা যুব আন্দোলন উন্নত নীতিনৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য একটা চেষ্টা আমরা শুরু করি। শ্রদ্ধেয় নেতা প্রয়াত কমরেড রবি বসু এস ইউ সি আই দলের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমি যুবকদের সংগঠিত করার কাজগুলি করতে শুরু করি।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে যুবযোগাযোগগুলি নিয়ে আমরা একটা বৈঠক ডাকি। তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নিয়ে গণতান্ত্রিক যুব সংগঠন গড়ে তোলার জন্য একটি কনভেনিং কমিটি করা হয়। আমাকে করা হয় তার কনভেনার, চেয়ারম্যান করা হয় সুহৃদ মিত্রকে, 'আফসার' কাগজের সম্পাদক ইব্রাহিম হৌসকে করা হয় সহসভাপতি। এইরকম একটা সাংগঠনিক রূপ নিয়ে আমরা শুরু করি। এছাড়াও সে সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কমরেড অজিত সেন, অসীম সিনহা, জ্ঞানেশ রায় এবং খ্যাতনামা শিল্পী কমল বসু। আমরা এক বছরের মধ্যেই একটি সফল কনভেনশনের মধ্য দিয়ে, গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিই। সেই সংগঠন আজ এতবড় আকার ধারণ করেছে। এই যে বিরাট সম্মেলন আপনারা করছেন, বিশাল সংখ্যক প্রতিনিধি আপনারা সমবেত হয়েছেন, আপনাদের আমি আমার দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে পরেই আমি আমার নিজের দেশ বাংলাদেশে ফিরে যাই। সাথে নিয়ে যাই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা — যতটুকু আমি বুঝেছি এবং তাঁর কিছু পুস্তক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, যা একটি মহান আন্দোলন, ত্যাগের আন্দোলন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা — সেই স্বাধীনতার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য তাকে বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত স্বার্থে, শ্রেণীস্বার্থে, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থে আত্মসাৎ করে দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং একটি 'ডেসপটিক রুল' (স্বৈরাচারী শাসন) দেশের উপর চাপিয়ে দিল। এগুলির বিরুদ্ধে তখন যুব মনে একটা বিক্ষোভ, সংগ্রাম গড়ে উঠছিল। সেই সময়ে আমি এবং আমার সহযোগী কয়েকজন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে, বিশেষ করে কীভাবে একটি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে উঠবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এবং সেই আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে, যুবকদের মধ্যে তার একটা প্রবল প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছি। তাঁরা একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন, নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার থেকেই একটা দল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে তোলার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে চলেছি।

এখানে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আপনারা যদি আপনাদের ব্যক্তিগত সচেতনতা ও উদ্যোগকে বাড়াতে পারেন, তার প্রতিটি কথা উপলব্ধি করে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের একটা উঁচু মান অর্জন করতে পারেন এবং জনগণের সংগ্রামগুলো গড়ে তুলতে পারেন, তবে তার দ্বারাই আপনারা ভারতবর্ষের মানুষকে মুক্ত করতে পারবেন এই আশা রেখে, আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কমরেড প্রভাস ঘোষ

যুব সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তিনি তাঁর ভাষণে সম্মেলনে উপস্থিত যুব প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংগঠকদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন — ডি ওয়াই ও-র এই সম্মেলন একটা মামুলি অনুষ্ঠান নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের যুবসংগঠনের সম্মেলনে তাদের রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমোদপ্রমোদ, ভোজন ইত্যাদিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র আমরা। আমাদের লক্ষ্য — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

তিনি বলেন, '৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক শোষণকে টিকিয়ে রাখতে তারা নৈতিকভাবে যুবশক্তিকে ধ্বংস করতে চায়। এ কাজ শুরু করেছিল শাসক কংগ্রেস। একই কাজ সিপিএম, বিজেপি সকলেই করে যাচ্ছে। তারা জানে, যৌবন যদি বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে জেগে ওঠে তবে কামান-বন্দুক দিয়ে তাকে রোখা যাবে না। তাই তারা যুবশক্তির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য মদ, ক্যাবারে নাচ, ব্লু ফিল্ম, অনলাইন লটারি, সাট্টা-জুয়ার অবাধ প্রসার ঘটাচ্ছে। যুবসমাজকে মদের ব্যবসা, নারী পাচার, স্মাগলিং, নানা অনৈতিক কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম-এর মতো দলগুলি নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যেতে চায়, এজন্য তাদের টাকার দরকার। তাদের নির্বাচনী তহবিলে সেই টাকা জোগায় শিল্পপতি, কালোবাজারি, ফাটকাবাজ, স্মাগলার, নারীপাচারকারীরা। ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়ে এই দলগুলি পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করে। আগের দিনের জমিদারদের নায়েবের মত রাষ্ট্র চালাবার জন্য পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার চাই। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীর সেই পলিটিক্যাল ম্যানেজার ! জমিদাররা যেমন নায়েব বদলাতো, তেমনি এরাও মাঝে মাঝে সরকার বদলায়। ভোটে জেতার জন্য এদের চাই অন্ধ স্তাবকের দল। তাই এরা শিক্ষার মর্মবস্তু মারছে। গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, তমসাচ্ছন্ন ভাবধারার চর্চা বাড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী প্রাণসত্তাকে বাদ দিয়ে ততটুকু কারিগরি জ্ঞান দিচ্ছে যতটুকু মেশিন চালাবার জন্য প্রয়োজন। এইভাবে একদিকে বিজ্ঞানের কারিগরি জ্ঞান, অন্যদিকে চিন্তায় তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা ও অন্ধতার মিশ্রণে, অধ্যাত্মবাদের মিশ্রণে তারা ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করছে। আপনারা মনে রাখবেন, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে নতুন উন্নত আদর্শ চাই। একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদী, মানবতাবাদী আদর্শ। আজকের লড়াইয়ের আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। পুঁজিবাদী সমাজের বিষ আমাদের স্বার্থপর করছে, অমানুষ করছে, মনুষ্যত্ব মারছে। এর হাত থেকে বাঁচতে চাই বিপ্লবের সাধনা, চাই প্রকৃত বিপ্লবী দল এবং নেতৃত্ব, আর চাই বিপ্লবী আদর্শের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

তিনি বলেন — ধাতুকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করার মতো যুবকদেরও নিজেদের সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে উন্নত চরিত্র অর্জন করতে হবে। প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্বে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করে বিবেককে গ্রহণ করতে হবে। এ লড়াই আপন নিয়মে হয় না, সচেতনভাবে এজন্য লড়তে হয়। এদেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যৌবনকে জাগিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তাঁর চিন্তাকে অবলম্বন করেই যুবআন্দোলন গড়ছে ডি ওয়াই ও। এ কাজ করতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নদীর জলবণ্টন সমস্যা

দুয়ের পাতার পর

করে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ঘটানো এবং এই পথে একটি আধুনিক জাতি গঠন করার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও সেই দুর্বলতার জের চলছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও মনোভঙ্গি গড়ে ওঠার বদলে আমাদের রাষ্ট্রীয় মননে 'খণ্ড জাতীয়তার মানসিক জটিলতা' মিশে রয়েছে। এই মানসিক জটিলতা প্রায়শই কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়কে দমন করা বা তাদের ওপর প্রভুত্ব করার প্রবণতার জন্ম দেয়। এই মনোভাব যে শুধু অঞ্চলভেদে দেখা যায় তা নয়, এমনকী দু'টি গ্রামের মধ্যেও এই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো এই ধরনের জাতিভিত্তিক বা আঞ্চলিক মানসিকতা উসকে তুলে নদীর জলবণ্টনের প্রশ্নটি এমনভাবে জটিল করে তোলে যে একে কেন্দ্র করে দু'টি রাজ্যের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে।

নদীর জলবণ্টনের প্রশ্নে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য দু'টিতে। কংগ্রেস বা বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলি পাঞ্জাবে দাঁড়িয়ে হরিয়ানাকে এক বিন্দু জল না দেবার শপথ নেয়, তারাই আবার হরিয়ানায় গিয়ে যেকোন মূল্যে পাঞ্জাব থেকে জল নিয়ে আসার দাবিতে গলা ফাটায়। স্বাধীনতার পর থেকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে পুঁজিপতিদের সেবা করে চলা কংগ্রেস হরিয়ানায় বসে বলছে চৌতালা সরকার হরিয়ানার স্বার্থ দেখছে না; পাঞ্জাবের প্রাক্তন অকালি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের সঙ্গে চৌতালার ঘনিষ্ঠতাই তার প্রমাণ। আবার এই কংগ্রেস দলই পাঞ্জাবে অকালি দলকে হরিয়ানার স্বার্থ দেখার জন্য দোষারোপ করে। এজন্য অকালি দলের মুখ্যমন্ত্রী বার্নালার সময়ে 'এস ওয়াই এল' খালের ৮৫-৯০ ভাগ নির্মাণ করে হরিয়ানাকে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করার দৃষ্টান্ত তারা দেখায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সময় একইসঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে এবং কেন্দ্রের সরকারি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও জলবণ্টন সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস কেন বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি — এ প্রশ্নের কোন জবাব তারা দেয় না। একই আচরণ করেছে বিজেপি। কেন্দ্রে যখন বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসীন, তখন পাঞ্জাবে ক্ষমতায় রয়েছে অকালি-বিজেপি জোট সরকার; হরিয়ানাতেও সেই সময় ক্ষমতায় রয়েছে হরিয়ানা বিকাশ পার্টি ও বিজেপির জোট — অথচ কংগ্রেসের মতো এই দুই সরকারও পাঞ্জাব - হরিয়ানার জলবণ্টন সমস্যা সমাধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। এই হচ্ছে প্রধান সর্বভারতীয় দু'টি দল কংগ্রেস ও বিজেপি'র চেহারা। এ প্রসঙ্গে অকালি দল, আই এন এল ডি কিংবা হরিয়ানা বিকাশ পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।

এই বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিটিই নিজের নিজের রাজ্যে কোন-না-কোন পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে সরকারি গদির জন্য লড়ছে এবং গদিতে বসছে। তাই এই দলগুলির কথা এবং কার্যকলাপ কমবেশি একই সুরে বাঁধা। স্বভাবতই এরা সকলেই শুধু বিভিন্ন রাজ্যের ভিতরেই নয়, এমনকী একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও জলবণ্টনের বিষয়টি নিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। হরিয়ানায় 'লাল'দের (দেবীলাল, বংশীলাল এবং ভজনলাল) জমানা এরই জ্বলন্ত নিদর্শন। দক্ষিণ হরিয়ানার রেওয়ারি, মহিন্দরগড় এবং সংলগ্ন জেলাগুলির শুষ্ক, অনুর্বর, মরুপ্রায়, খরাপ্রবণ এবং এক-ফসলি অঞ্চলে খালের জল পৌঁছে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। অথচ রাভি এবং বিপাশা থেকে আসা ১৮ লক্ষ একর ফুট জলের পুরোটাই ধনী কৃষক অধ্যুষিত শীরসা, হিসার-ফতেহাবাদ এবং জিন্দ জেলার নারওয়ানা তহশীল এলাকার কাপড় কলগুলির প্রয়োজনে তুলো চাষের কাজে লাগানো হয়েছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চৌতালা সহ পূর্বোক্ত তিন 'লাল' মুখ্যমন্ত্রীও এই এলাকারই বাসিন্দা —এটাও লক্ষণীয়।

এইসব বিবদমান পরিষদীয় দলগুলি রাজ্যের বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, যারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত। যেমনভাবে ধনী চাষী নিজের টিউবওয়েলের জল গরিব চাষীকে মুনাফার জন্য বিক্রি করে, তেমনই এই রাজনৈতিক দলগুলি নদীর জল বা এই ধরনের কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে মুনাফা লোটার উপায় হিসাবে গণ্য করে। একবার ক্ষমতায় বসতে পারলেই এই দলগুলি নিজেদেরকে রাজ্যের যাবতীয় জলসম্পদের মালিক বলে মনে করে এবং গরিব সাধারণ মানুষের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তাদের প্রকৃত প্রভু শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবায় তা কাজে লাগায়।

(আগামী সংখ্যায়)

মেদিনীপুর

বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথঅবরোধে পুলিশের লাঠি চার্জ, আহত ২৭

১ সেপ্টেম্বর থেকে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অত্যধিক হারে বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। প্রতি কিমি ভাড়া ছিল ৩০ পয়সা, বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৪ পয়সা। প্রাথমিক স্টেজ ছিল ৬ কিমি পর্যন্ত, তা কমিয়ে করা হয়েছে ৪ কিমি। এই অন্যায় অযৌক্তিক ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ভাঙাচোরা বাসরাস্তা সারানোর দাবিতে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ১-৬ সেপ্টেম্বর ব্যাপক প্রচার, পথসভা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর ৭ সেপ্টেম্বর দুই মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাসস্টপগুলিতে এক ঘন্টা প্রতীকী বাস অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের মানিকতলায় বাস অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে তমলুক থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জীপে তুলতে চাইলে বিক্ষোভে সামিল যাত্রী ও কমরেডদের প্রবল বাধায় পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপরে নৃশংসভাবে পুলিশ আবারও লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জে কমরেডস্ স্বপন সামন্ত ও সবিতা সামন্তর মাথায় আঘাত লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এঁদের দুজনকে তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া আরও ১৯ জন কর্মী আহত হয়। যাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পুলিশের এই বর্বরোচিত লাঠিচার্জের ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এতদিন খবরে কাগজে, টিভিতে দেখতাম — আজ প্রত্যক্ষ দেখে বুঝলাম পুলিশ কত নিষ্ঠুর ও হিংস্র হতে পারে। হাসপাতাল থেকে স্বপন সামন্ত ও সবিতা সামন্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেউলিয়াবাজার স্টপে ৬নং জাতীয় সড়কে (বোম্বে রোড) পথ অবরোধে পুলিশ প্রবল লাঠি চার্জ করে কমরেড মেঘনাদ খামরুই-এর পা ভেঙে দেয়। এছাড়া ৭ জন কর্মী আহত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদায় ৪১নং জাতীয় সড়ক, চণ্ডীপুর, হলদিয়ার চৈতন্যপুর, বলাইপণ্ডা, কাঁথি, এগরা, বাজকুল, ভগবানপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহর, বেলদা, খাকুর্দা, তেমাথানী, খুকুর্দা প্রভৃতি স্থানে পথ অবরোধ হয়। বেলদাতে সিপিএম ও পুলিশ যৌথভাবে অবরোধকারীদের আক্রমণ করে। তেমাথানীতে সিপিএম বাহিনী অবরোধ ভাঙতে এলে জনগণের প্রতিবাদে তারা পিছু হঠে যায়।

শান্তিপূর্ণ অবরোধে পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর দুই জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

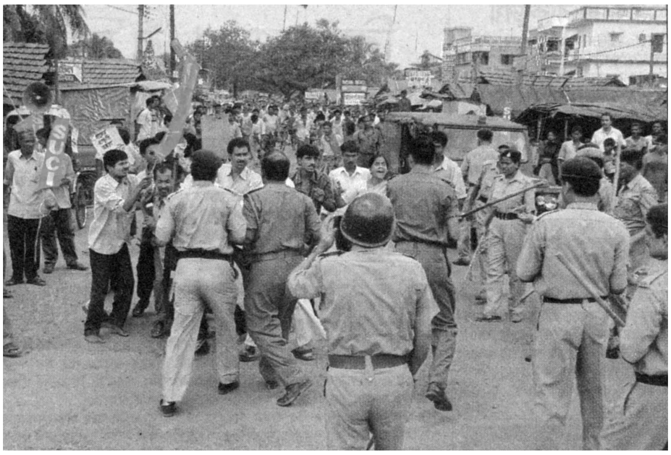

তমলুকের মানিকতলা মোড়ে পুলিশের লাঠিচার্জ

জয়নগরে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৪-৬ সেপ্টেম্বর বহড়ু হাইস্কুল মাঠে এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ডি ওয়াই ও'র যুব কর্মী ও জেলার পার্টি কর্মী মিলিয়ে ৩০৭১ জন উপস্থিত ছিলেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' পুস্তিকাটিকে ভিত্তি করে এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলান, বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কমরেড প্রভাস ঘোষ অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে মানব সমাজের বিকাশের ধারাটিকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে দেখান বর্তমান মানব সমাজ তথা জনজীবনের সমস্ত সংকটের মূল কারণ হল পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা উৎখাতের মধ্য দিয়েই একমাত্র শোষিত মানুষের মুক্তি আসতে পারে। এক্ষেত্রে দলের কর্মীদের করণীয় কী তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষার যথাযথ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করা ছাড়া বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার অন্য কোন পথ নেই। উপস্থিত ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-মহিলারা গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে এই আলোচনা শোনেন।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা রাজপথে

রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট করে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থানে সামিল হন।

অবিলম্বে রাজ্যে নতুন ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা, ৪৫ হাজার শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, সর্বনাশা সর্বশিক্ষা অভিযান বাতিল করা, শিক্ষকদের মাস পয়লা বেতন, অবসরের দিনই পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রদান, বকেয়া ৬৩ হাজার শিক্ষককে এক মাসের মধ্যে পেনশন প্রদান, অবিলম্বে টিচার্স হেল্থ হোম গঠন ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা সহ বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ও সমিতির নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ থেকে রাজ্যপালের দপ্তরে গিয়ে ১৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কার্তিক সাহা, অজিত হোড়, অনুকূল বর, অসীম ভট্টাচার্য, উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করার কথা থাকলেও কেউ উপস্থিত না থাকায় শিক্ষকরা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থানের সামনে বক্তব্য রাখছেন বি পি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা

সহস্রাধিক রিক্সা শ্রমিকের ডেপুটেশন

রিক্সাচালক সহ সমস্ত গরিব মানুষকে বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, হাসপাতালে বিনাপয়সায় চিকিৎসা এবং হেল্থ কার্ড চালু করা, রেশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা, রিক্সা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের বিনাপয়সায় চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া, রিক্সা শ্রমিকদের পরিচয়পত্র এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা, পৌরকর এবং পঞ্চায়েতি ট্যাক্স ও খাজনা প্রত্যাহার করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় রিক্সা স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করা এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত পুরুলিয়া রিক্সা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে সহস্রাধিক রিক্সা শ্রমিক রিক্সা সহ ২ সেপ্টেম্বর জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে সামিল হন।

এই সমাবেশ থেকে শ্রমিকদের পক্ষে কমরেড রঙ্গলাল কুমার সহ ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে পেশ করেন। এই সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রিক্সা শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেত্রী কমরেড মধুমিতা মাহাতো।

ডি ওয়াই ও সম্মেলন

পাঁচের পাতার পর

গিয়ে সংকট, পদে পদে বাধা আপনাদের অতিক্রম করতে হবে। আপনাদের বিপদসঙ্কুল বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য চাই উন্নত হৃদয়বৃত্তি, কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র, আর চাই জ্ঞান, চাই মনের শক্তি, চাই সকলের সাথে ঐক্য রক্ষা করে সংগ্রামের জন্য অহম্ মুক্ত চরিত্র। জ্ঞান ছাড়া এসব অর্জন করা যায় না।

রাজ্যে রাজ্যে এস ইউ সি আই-এর সাংগঠনিক বিস্তারের পিছনে কঠোর সংগ্রাম, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পার্টির প্রথম সারির নেতাদের সংগ্রামের উল্লেখ করে তিনি বলেন — সংকট আজ আরও বাড়ছে, আগামী পাঁচ বছরে এদেশে বেকার দ্বিগুণ হয়ে যাবে, শিক্ষার সুযোগ আরও কমবে। অপরাধ, ধর্ষণ বাড়ছে, আরও বাড়বে। ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি তীব্র হবে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সংকটে জর্জরিত। যুদ্ধ ছাড়া সে টিকে থাকতে পারছে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অন্ধকারময় পরিস্থিতি কি আমরা চলতে দিতে পারি ? স্বদেশী যুগে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংদের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী এদেশের যুবসমাজ। প্রীতিলতা, কানাইলাল, বিমল দাশগুপ্ত, এমন কতো নির্ভীক যোদ্ধা এদেশে ছিলেন। অনেকে এদের পাগল বলেছে, কিন্তু এঁরা ছিলেন যৌবনের অগ্রদূত, মুক্তিপাগল। সত্যিকারের মানুষের মতো বাঁচার মানে এঁরা বুঝেছিলেন। আজ আমাদের এমন যুবক চাই যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবের সাধনায় নিজেদের উজাড় করে দেবে। এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের শেষে কিশোর শহীদ কমরেড মাধাই হালদারের উপর রচিত "পক্ষীরাজে পাড়ি দিল মাধাই রাজকুমার" সঙ্গীত পরিবেশন প্রতিনিধি অধিবেশনের পরিবেশকে ভারি করে তোলে ; প্রতিনিধিদের চোখে জল এনে দেয়। সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিরা তাদের নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান আগামীদিনে আরও শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে। প্রতিনিধি অধিবেশনের সমাপ্তিতে তাদের প্রত্যেকের স্লোগানে ধ্বনিত হয় সেই প্রত্যয়।

বিদ্যুৎ আন্দোলনে নতুন জোয়ার

সারা রাজ্যে বিল বয়কট

একের পাতার পর

বাধা দেয়। সেখানে এক সভা হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক নৃপেন চক্রবর্তী, স্বপন পালিত, তপন সরকার প্রমুখ ভাষণ দেন। তারপর ১৫৫ জন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

কোচবিহার

প্রস্তুতিপর্বে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আইন অমান্যের দিন প্রবল বৃষ্টি সত্ত্বেও দেড় শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক সত্যেন ঘোষ, সমীর গুহ মজুমদার, কাজল চক্রবর্তী ও পীযূষ সরকারের নেতৃত্বে মিছিল করে জেলা সদরে আইন অমান্য করেন। পুলিশ তাদেড় গ্রেপ্তার করে।

দার্জিলিং

শিলিগুড়ি কোর্ট ময়দানে সকাল থেকে বিরাট পুলিশবাহিনী মজুত ছিল। এরই মধ্যে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির শতাধিক সদস্য সেখানে জমায়েত হন। পরে আইন অমান্য করার সময় বহু সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে যায় এবং গ্রাহকদের উৎসাহিত করতে থাকে।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক জমায়েত হয়ে কুনাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ডি এম অফিসের দিকে আইন অমান্য করার জন্য মিছিল করে এগোতে থাকেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকাল থেকেই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মিছিলের দু'পাশে বহু সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ ঐ বিদ্যুৎগ্রাহকদের গ্রেপ্তার করে।

নদীয়া

ছয় শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক কৃষ্ণনগরের ক্ষৌনিশ পার্কে জমায়েত হয়ে চন্দন চক্রবর্তী, তপন ঘোষ ও তরুণ ভদ্রের নেতৃত্বে ডি এম বাংলোর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশ রবীন্দ্রভবনের সামনে মিছিলের গতিরোধ করে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

উত্তর ২৪ পরগণা

প্রায় তিন শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক অনুকূল ভদ্র ও দুলাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বারাসত কোর্টে মিছিল করে যান এবং আইন অমান্য করেন।

হুগলি

চুঁচুড়াতে জেলার আট শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক মণিমোহন ঘোষ, প্রদ্যুৎ চৌধুরী, মহাদেব কোলে ও কমল মল্লিকের নেতৃত্বে মিছিল করে ডি এম অফিসের সামনে আইন অমান্য করার জন্য অগ্রসর হন। গাড়ি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় ৫০০ গ্রাহককে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে আইন অমান্য করতে চলেছেন সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস সহ অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ ও বিদ্যুৎ গ্রাহকরা

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া রেল স্টেশনে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির ৩৫০ জন সদস্য জমায়েত হয়ে মিছিল করে ডি এম-এর অফিসে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং সকলকেই গ্রেপ্তার করে। পঁচাত্তর-আশি বছরের বিদ্যুৎ গ্রাহকরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি। পরে সহকারী ডি এম লাঠিচার্জের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং গ্রেপ্তার হওয়া গ্রাহকদের ছেড়ে দেন। গ্রাহকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিবপ্রসাদ দরিপা, বলরাম পাল, জয়দেব কর এবং স্বপন নাগ।

বর্ধমান

ডি এম অফিসের সামনে দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক আইনঅমান্য করেন। পুলিশ আইন অমান্যকারীদের উপর লাঠি চালায়। আইনঅমান্যে নেতৃত্ব দেন অশোক দাঁ, সঞ্জয় চ্যাটার্জী ও হিমাদ্রী দে।

পুরুলিয়া

দেড়শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক ডি এম অফিসের সামনে মিছিল করে অগ্রসর হলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, শৈলেন বাউরী ও গৌতম হাতি।

বীরভূম

সিউড়ী কোর্টের সামনে প্রায় তিন শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক আইন অমান্য করেন। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

৩০০ জন বিদ্যুৎগ্রাহক ডি এম বাংলোর সামনে আইন অমান্য করতে গেলে পুলিশ বিনাপ্ররোচনায় ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। ৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আইন অমান্যে নেতৃত্ব দেন অমল মাইতি, নারায়ণ দাস, ভানুরতন গুঁই, তপন দাস, শ্যামল দাস, জগন্নাথ দাস প্রমুখ।

পূর্ব মেদিনীপুর

২০০ জন বিদ্যুৎগ্রাহক জেলা অফিসের সামনে আইন অমান্য করেন।

৯ সেপ্টেম্বরের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে অ্যাবেকার নেতৃত্ব এক বিবৃতিতে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ঃ

২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের কাছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ডেপুটেশন।

১০ অক্টোবর ১০ লক্ষ স্বাক্ষর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মহাকরণ অভিযান।

বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আইন অমান্য

এ আই ডি এস ও'র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ছাত্র সম্মেলন

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ আই ডি এস ও'র ৬ষ্ঠ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর জয়নগর শহরে। ৩ সেপ্টেম্বর জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটির রক্তাখাঁ পাড়া মাঠে ছাত্র-যুব প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল। উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা যুব নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

৪ সেপ্টেম্বর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয় 'শহীদ কমরেড অশোক হালদার মঞ্চ'। কমরেড অশোক হালদার ছিলেন ডি এস ও'র প্রাক্তন জেলা সম্পাদক, যাঁকে গত ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে খুন করে। প্রতিনিধি সম্মেলনে মূল প্রস্তাব, সাংগঠনিক রিপোর্ট ছাড়াও প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ও যথাসময়ে সরকারি বই সরবরাহ, কুলতলীতে কলেজ স্থাপন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সাহারা ইন্ডিয়াকে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা লীজ দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড নবেন্দু পাল, সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। কমরেড প্রদীপ হালদারকে সভাপতি ও কমরেড বিশ্বনাথ সরদারকে সম্পাদক করে ৫০ জনের শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

গাইঘাটায় বাড়তি খাজনা ফেরত দিতে বাধ্য হল কর্তৃপক্ষ

কৃষিজমিকে বাণিজ্যিক হিসাবে দেখিয়ে গাইঘাটার রেভেনিউ ইন্সপেক্টররা ৫ টাকার খাজনা বাড়িয়ে একর প্রতি ৩৮০০ টাকা আদায় করেছিল। এই বেআইনি জুলুম প্রতিরোধে গত ৭ আগস্ট, সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লকের পাঁচপোতায় আর-আই অফিস ঘেরাও করা হয়। ডেপুটেশনে এলাকার বহু কৃষক অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনের চাপে রাজস্ব পরিদর্শক স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সতিই বেআইনিভাবে বাড়তি খাজনা আদায় করা হয়েছে। সাথে সাথে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আদায় করা বাড়তি খাজনা ফেরত দিতে চাপ সৃষ্টি করেন। কর্তৃপক্ষ সেইসময় উপস্থিত কৃষক হরেন্দ্রনাথ দাস, বজলুর রহমান, প্রাণকৃষ্ণ দাস ও মনোরঞ্জন দাস ইত্যাদি কয়েকজন কৃষকের কাছ থেকে নেওয়া ৭০০০ টাকার বাড়তি খাজনা ফেরতের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। গণআন্দোলনের এই জয়ে এলাকার কৃষকরা খুব উদ্বুদ্ধ হয় এবং সাথে সাথে ভ্যানে মাইক লাগিয়ে পাঁচপোতা বাজার পরিক্রমা করে 'কৃষকমারা খাজনা নীতি'র প্রতিলিপি পোড়ান হয়। এই আন্দোলনের সাফল্যের সংবাদ হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে গোটা গাইঘাটা ব্লকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি আর আই ঘেরাও করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস, জেলা কে কে এম এস-এর সহ সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী ও ব্লক সম্পাদক কমরেড রবীন বিশ্বাস।

ব্রিজ ভেঙে রঘুনাথপুর বিচ্ছিন্ন

সরকারি অবহেলা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের ফলে রাস্তা ও ব্রিজের সংস্কার না হওয়ায় রঘুনাথপুর মহকুমা জেলার অন্যান্য অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া রোডের ওপর ভুতামা ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর অনেক টালবাহানার শেষে অস্থায়ী ব্রিজ তৈরি হয়। রঘুনাথপুর-বরাকর রোডের ওপর হরিডি গ্রামের পাশের ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের চাপে তৈরি হয় একটি অস্থায়ী ব্রিজ। অনুরূপ ঘটনা ঘটে রঘুনাথপুর-সাঁওতালডি রোডের ওপর গোবিন্দপুর ব্রিজ এবং অহল্যাবাই রোডে কমলডাঙার কালভার্টের ক্ষেত্রেও। ইংরেজ আমলে তৈরি এই সেতুগুলি ভেঙে পড়ার আশঙ্কার কথা দলের পক্ষ থেকে বারবার সরকারি প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা না করায় একের পর এক সেতুগুলি ভেঙে পড়ছে। অনেক চেষ্টার পর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত সেই অস্থায়ী ব্রিজগুলিও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল গত ১৪ আগস্টের মাত্র একদিনের বৃষ্টিতে।

এই অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর রঘুনাথপুর শহর কমিটির উদ্যোগে ২৪ আগস্ট থানার সামনে পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশ অবরোধ ভাঙতে এসে গণপ্রতিরোধে পিছু হটে। অবশেষে দলের প্রাক্তন এম এল এ কমরেড বিজয় বাউরি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে প্রশাসনিক কর্তারা আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। সমস্যা সমাধানে মহকুমা শাসক ও পি ডব্লিউ ডি অফিসারদের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

গণদাবী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ৫৭ বর্ষ / ৮ সংখ্যা

বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বানে ২৯ সেপ্টেম্বর মহামিছিল

একের পাতার পর

চাষীদের মাথায় হাত। কেমন করে বাঁচবে তারা, কেমন করে বাঁচাবে নিজেদের পরিবারকে! কৃষি-সার ও কীটনাশক ওষুধের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। অথচ বাজারে ফসলের দাম নেই। ফসল বাজারে বেচে চাষের খরচটুকুও ওঠেনা। চাষের জন্য নেওয়া ঋণের টাকা সুদ সহ ফেরৎ দেবে কেমন করে, সংসারের খরচই বা চলবে কী করে! বাজারে ফড়ে ও দালালদের দাপট, কালোবাজারীদের রমরমা। শাসকদলের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া। তারাই ধান, পান, সব্জী সহ সব ফসলের দাম ওঠায় নামায় — বিপুল মুনাফা কামায়। ওদের পৌষ মাস, আর চাষীর সর্বনাশ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সব জেনেও এই প্রক্রিয়া চলতে দিচ্ছে। ঋণগ্রস্ত চাষী বছর বছর মার খায়, উঠে দাঁড়াবার পথ খুঁজে পায়না, বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। এ রাজ্যে বেশ কয়েকজন আলু চাষী ও করলা চাষীর আত্মহত্যা আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। গরিব চাষী ধানকাটার পর পরই ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, ধান মজুত করে রাখার ক্ষমতা তার নেই। ফলে মজুতদারেরা কম দামে কিনে নেয়। তারপর কৃষক দরদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রাজ্য সরকার মাঠে নামে, ধানের নির্ধারিত মূল্য ঘোষণা করে জানিয়ে দেয় যে, এর কমে কেউ ধান কিনতে পারবে না। তখন কিন্তু গরিব চাষীর ঘরে ধান নেই। ধনী চাষীরা এর সুযোগ নেয়, মুনাফা লোটে, সরকার কৃষক দরদের ঢাক পেটায়।

রাজ্য সরকার চাষীদের পরামর্শ দিচ্ছে, অর্থকরী ফসলের চাষ করো — সূর্যমুখী, টমেটো, কপি ইত্যাদি — যা বিদেশে রপ্তানি করে বেশি অর্থাগম হবে। চাষীরা ছুটছে সেই পরামর্শ মাফিক। সরকারি কৃষিদপ্তর থেকে হাইব্রিড বীজ কিনে চাষীরা চাষ করল, ফলনই হল না, কারণ — ওগুলি ছিল বাঁজা বীজ। সার-বীজ-ওষুধ-জল কিনেও সর্বস্বান্ত হওয়ায় হতাশ চাষী আগুন ধরিয়ে দিল মাঠের পর মাঠ সূর্যমুখী গাছে। সরকার কমিশন বসাল, কমিশন রায় দিল — সরকারের দোষ নেই, সব দোষ চাষীদের, ওরা নিয়ম মত চাষ করেনি। আবার টমেটো চাষে দেদার ফলন হল। কিন্তু ফড়ে ও দালালদের কল্যাণে বাজারে তার দাম ২৫ পয়সা কেজি, বাজারে বয়ে নিয়ে যাবারও খরচ উঠবে না। ফলে মাঠের পর মাঠ টমেটো পচল, চাষী ঋণের ফাঁদে আরও আরও জড়িয়ে পড়ল। ফলন না হলে তো চাষী ডুবছেই, আবার ফলন ভাল হলেও তারা ডুবছে। এই অবস্থায় গরিব সাধারণ চাষী কেমন করে বাঁচবে — সরকারের যেমন কোন মাথাব্যথা নেই, তেমনি তথাকথিত বিরোধী দলগুলিরও কোন উৎকণ্ঠা নেই। বরং দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি যাতে চাষীদের এই হতাশার সুযোগে গ্রামে ঢুকে বিপুল জমি লিজ নিয়ে অর্থকরী ফসল ফলিয়ে মুনাফা লুটতে পারে — তার ব্যবস্থা করে দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উদ্যোগী।

চাষী যাতে সস্তায় সার বীজ কিনতে পারে, বাজারে যাতে ফসলের ন্যায্য দাম পায় — তার জন্য কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারি কোনও ন্যূনতম উদ্যোগ কোথাও নেই। তার উপর সরকারের পক্ষ থেকে জমির খাজনা ও সেচকর বাড়ানো হয়েছে, কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে, পানের বরজ সহ সাইকেল রিক্সা প্রভৃতির উপরও পঞ্চায়েত কর বসানোর উদ্যোগ চলছে। বেড়ে চলেছে কেরোসিন সহ সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। জীবনদায়ী ওষুধের দাম তো বাড়ছে একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরকারি হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি ও তার ব্যবসায়ীকরণ করা হচ্ছে। খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমিকদের গ্রামে কাজ থাকে মাত্র কয়েকটা মাসের জন্য; ওরা ছোটে শহরে, শহরেও ভিড় কাজের সন্ধানে, কিন্তু কাজ মেলে কই? কে ভাবে এদের সারা বছরের কাজের কথা, এদের স্ত্রী পুত্র কন্যা বাবা মা ভাই বোনেদের বাঁচানোর কথা?

দেশের কল-কারখানাগুলোর অবস্থা কী? নতুন গড়ে তোলা দূরের কথা, 'বাজার নেই' এই অজুহাতে মালিকরা একের পর এক গড়ে-ওঠা কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, খরচ কমানোর অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মালিক মেরে দিচ্ছে, কোথাওবা চাপ দিয়ে কম মজুরিতে শ্রমিকদের কাজ করানো হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে প্রায় দেড় হাজার চা-বাগান শ্রমিক ইতিমধ্যেই মারা গেছে। কাজ হারানো শ্রমিক ক্ষুধার জ্বালায় কোথাও নিজেরা, কোথাও বা সপরিবারে আত্মহত্যা করছে। এসবের কিছু কিছু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও হয়ে যাচ্ছে। আর সরকার যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না — এমন ভান করছে। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই শিল্প মালিকদের বিপুল হারে ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে, বিক্রয়কর ছাড় দিচ্ছে, শত শত কোটি টাকা মকুব করে দিচ্ছে, ভরতুকি দিচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক যখন তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের দাবিতে আন্দোলনে নামছে তখন সরকার তাদের উপর সশস্ত্র পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে, আন্দোলন দমন করছে, গুলি চালিয়ে শ্রমিক হত্যা পর্যন্ত করছে, মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিক মুজিবর সেখ হত্যা যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিল্পপতিদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শিল্পে সঙ্কটের সব দায় শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, ঠিক যেমনটি করে থাকে অন্যান্য সব বুর্জোয়া পার্টি এবং বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলি। গত ২১ আগস্ট মুম্বাইতে শিল্পপতিদের সভায় তাদের খুশি করতে তিনি বলেছেন, ''ট্রেড ইউনিয়নকে এখন উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, ...ট্রেড ইউনিয়ন এখনো ষাট-সত্তরের ভুল পথে হাঁটতে চাইছে, আন্দোলনের নামে শৃঙ্খলা ভাঙতে চাইছে, এসব চলবে না। ঘেরাও, জঙ্গি আন্দোলন বন্ধ করতে হবে, না হলে আমি পুলিশ পাঠাবো।' কিন্তু মালিক যদি শ্রমিকের মজুরি ও পি এফের টাকা মেরে দেয়, যখন তখন কারখানা বন্ধ করে দেয়, শ্রমিক ছাঁটাই করে এবং পরিণতিতে অনাহারে শ্রমিক পরিবারগুলিকে মরতে হয় বা আত্মহত্যা করতে হয়, মুখ্যমন্ত্রী বলুন, তখন তিনি বা তাঁর পুলিশ কী করবে। না, সে প্রসঙ্গে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নীরব। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম আইনেও যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার দেওয়া হয়েছে পুঁজিপতি-মালিকশ্রেণীর হাতে। সভ্যতার স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপন্ন অবস্থায় কে দাঁড়াবে তাদের পাশে?

কৃষক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপরও নেমে এসেছে মারাত্মক আক্রমণ। পূর্বতন বিজেপি জোট সরকারের আমলে তৈরি হয়েছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। উদ্দেশ্য — সরকারি কোষাগার ও শ্রমিকদের পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে ভেঙে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রশস্ত করা, বিদ্যুতের সামাজিক পরিষেবার চরিত্র ধ্বংস করে তাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করা এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক কর্মী সংকোচন ঘটানো। রাজ্যের সিপিএম সরকার এবং মালিক গোয়েঙ্কার যোগসাজসে এরাজ্যে গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ গ্রাহকদের ঘাড়ে বিদ্যুতের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপানো হচ্ছে। অপরদিকে বৃহৎ শিল্পপতি ও বড় বড় গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম কমানো হচ্ছে এবং তাদের টাকা ফেরত দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে। সিপিএম সরকার এর সবটাই করছে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের দোহাই দিয়ে। অথচ সেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন পরিবর্তনের দাবি তারা কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস সরকারের কাছেও জানাচ্ছে না, কিংবা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ কমিশন ঘোষিত দাম কমানোর যে সুযোগ আইনেই আছে তাকেও কার্যকরী করছে না। ফলে সরকার যেখানে সরাসরি মালিকদের পক্ষে কাজ করছে এবং সাধারণ গ্রাহকদের উপর আক্রমণ হানছে, সেক্ষেত্রে জনস্বার্থের লড়াই লড়বে কে?

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে জাতীয় নেতাদের দাবিই ছিল — শিক্ষা হবে সূর্যের আলোর মত, সেখানে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ থাকবে না, সকলের থাকবে সম-অধিকার। অথচ সেই শিক্ষার উপরও নেমে এসেছে আক্রমণ। স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপানো হয়েছে ব্যাপক হারে ফি ও ডোনেশনের বোঝা। এমনিতেই একটা বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুল স্তরেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় দারিদ্র্যের কারণে। এবার ফি ও ডোনেশনের চাপে আরও বহু ছাত্রের সামনে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার দরজা। টাকা যার, শিক্ষার অধিকার কেবল তারই। প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা নেই। শিক্ষার ভিতটাকেই ধ্বসিয়ে দেবার পরিকল্পিত আয়োজন। এখন আবার ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ। 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নামে ৮ম শ্রেণী থেকে তারা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে চলেছে নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বিষয়গুলিকে।

এদিকে মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। এ বছর আরও এক হাজার মদের দোকান খোলা হবে — সিদ্ধান্ত হয়েছে। মদ্যপায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে সরকার উল্লসিত। এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির জন্য সরকার অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; রেডি টু ড্রিঙ্ক নামে হাল্কা নেশার মদ তারা বাজারে ছাড়ছে এবং সেগুলি বিক্রি হবে রেশন দোকান, মুদির দোকান প্রভৃতিতে। ছাত্র ও যুবকরা এই হাল্কা নেশায় অভ্যস্ত হলে পরে তারা কড়া নেশার মদে আসক্ত হবে। সরকারের লক্ষ্য — রাজস্ব বাড়বে, সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে। আর, সাধারণ মানুষ, চিন্তাশীল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আতঙ্কিত — ছাত্রযুব সাধারণ মানুষের বিবেক চরিত্র ধ্বংস হবে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন, নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্ম সমাজে আরও বাড়বে, সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ আরও বৃদ্ধি পাবে।

ফলে একদিকে চাষী মজুর মধ্যবিত্ত শ্রমিক সাধারণ মানুষ বিপন্ন। তাদের উপর দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ লুণ্ঠন আরও তীব্র হচ্ছে। সরকার নিজে ট্যাক্স খাজনা সেস ইত্যাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে চালাচ্ছে আরও শোষণ। পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে, বাস-ট্রাম-রেলের ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। আদিবাসী ও জঙ্গল এলাকার মানুষদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; আমলাশোলে ৫ জনের মৃত্যু তারই দৃষ্টান্ত। আর্সেনিক বিষ যুক্ত জল পান করে মানুষ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। সরকার কার্যত নীরব দর্শক। খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই; মানুষের জীবন ও সম্পত্তি চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে। অন্যদিকে মদ জুয়া সাট্টার নেশা, ব্লু-ফিল্ম ইত্যাদি দিয়ে মানুষকে মাতিয়ে রেখে তার বিবেক ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করার চেষ্টা চলছে — যাতে প্রতিবাদী মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া যায়।

সাধারণ মানুষের উপর এ এক সর্বাত্মক আক্রমণ। এই আক্রমণের বিরুদ্ধেই ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর মহামিছিল। তার আগে গ্রাম শহর শহরতলি বস্তি তোলপাড় করে সংগৃহীত হচ্ছে স্বাক্ষর; জনবিরোধী সরকারি ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের বাঁচার দাবিতে সংগৃহীত এই স্বাক্ষরগুলি নিয়ে মহামিছিল যাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সরকার দাবি না মানলে শুরু হবে সরকারি অফিস ঘেরাও, অবরোধ, আইন অমান্য করে কারাবরণ ইত্যাদি কর্মসূচি। সর্বস্তরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। সেজন্য এলাকায় এলাকায় সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটি গঠনের ডাক দেওয়া হয়েছে। জোর দেওয়া হয়েছে হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের উপর, যারা চাষী মজুর মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার মহান সংগ্রামে ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ আন্দোলনের ধারায় এসেছে এই মহামিছিলের ডাক, আবার এ মিছিল আগামী দিনের দুর্বার আন্দোলনের পাদপীঠ। জনগণের স্বার্থেই এ মিছিল, তাই একে সফল করতে হবে জনগণকেই।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে

সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশন

গান্ধী মেমোরিয়াল হল, নয়া দিল্লী

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net